সংযোগে নতুন সম্ভবনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল

মোস্তাফিজুর রহমান

দশ হাজার বছরের পুরনো ঐতিহাসিক নদী কর্ণফুলী। কর্ণফুলী তার অববাহিকার সব মানুষকে বুকে ধারণ করে আছে হাজার হাজার বছর ধরে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সব দিক থেকে কর্ণফুলী ঐতিহ্যবাহী। এ নদীর নামকরণের একটি উপাখ্যান রয়েছে- হারিয়ে যাওয়া কানের ফুল উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে রাজকুমারীর সাথে রাজকুমারও খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপ দিলে দু'জনেরই সলিল সমাধি হয়। সে বিয়োগান্তক ঘটনার কারণে এ নদীর নাম হয় কর্ণফুলী।

ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে পাহাড়-পর্বত ও গভীর অরণ্যে ঘেরা মিজোরাম রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত লুংলেই জেলা। জেলা সদর থেকে ৯৫ কিলোমিটার দূরে পাহাড় ঘেরা টলাবুং বা দেমাগ্রির লুসাই পাহাড় থেকে আন্তর্জাতিক নদী কর্ণফুলীর উৎপত্তি। সেখান থেকে সুউচ্চ পাহাড় শ্রেণী অতিক্রম করে থেগামুখ হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে কর্ণফুলী। পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটির বরকল উপজেলার থেগামুখ থেকে বড় হরিণার মুখ পর্যন্ত ছয় কিলোমিটার কর্ণফুলীর ডান পাশে রয়েছে ভারত এবং বাম পাশে বাংলাদেশ। হরিণা মুখের পর থেকে কর্ণফুলী সম্পূর্ণ বাংলাদেশের। উতলা খরস্রোতা পাহাড়ি নদী কর্ণফুলী বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হতে ১৮৭ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে। উল্লেখ্য, কর্ণফুলীর দৈর্ঘ্য ৩২০ কিলোমিটার। এর মধ্যে বাংলাদেশ অংশের দৈর্ঘ্য ২৭৫ কিলোমিটার। কর্ণফুলীর উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত দীর্ঘ পথজুড়ে দু'কূলে গড়ে উঠেছে নানা জনপদ ও নগরসভ্যতা। এ নদীর মোহনায় সৃষ্টি হয়েছে এক অভূতপূর্ব পোতাশ্রয়ের। চট্টগ্রাম মহানগরী থেকে ১৭ কিলোমিটার এগিয়ে কর্ণফুলী মিশেছে বঙ্গোপসাগরে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের লুসাই পাহাড় হতে উৎপন্ন হয়ে কর্ণফুলী নদী চট্টগ্রাম শহরকে দুই ভাগে বিভক্ত করে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। মূল শহর এবং চট্টগ্রাম বন্দর এলাকা কর্ণফুলী নদীর পশ্চিম পাশে এবং অন্য দিকে ভারী শিল্প এলাকা পূর্বপাশে অবস্থিত। নদীর মরফলজিক্যাল বৈশিষ্টের দ্বারা কর্ণফুলী নদীর তলদেশে পলি জমার কারণে চট্টগ্রাম বন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছিল। তাছাড়া বর্তমানে সচল দুটি ব্রীজ (কর্ণফুলী ব্রীজ প্রায় ৯.৫ কি.মি. উজানে এবং কালুরঘাট রেলওয়ে ব্রীজ প্রায় ২১ কি.মি. উজানে) দ্বারা ক্রমবর্ধমান যান চলাচল সামাল দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তাই চট্টগ্রাম বন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম অক্ষুন্ন রাখার নিমিত্ত পলি জমার সমস্যা সমাধান করতঃ চট্টগ্রাম শহরের জানজট নিরসন করে চট্টগ্রাম শহরকে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব তীরে সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে অন্য কোন ব্রীজ নির্মাণের পরিবর্তে নদীর নিচ দিয়ে টানেল নির্মাণের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি দূরদশী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১ সালে সেতু বিভাগের অধীন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিজস্ব অর্থায়নে এই প্রকল্পের কারিগরী ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা শুরু হয় এবং ২০১৩ সালে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা সমাপ্ত হয়। তারই ফলশ্রুতিতে ২০১৪ সালের জুন মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরকালে টানেলটি নির্মাণের লক্ষ্যে চীন সরকারের সাথে জি টু জি ভিত্তিতে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও China Communications Construction Company Ltd. -এর মধ্যে টানেল নির্মাণের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় । ২০১৫ সালের নভেম্বরে ECNEC- কর্তৃক "কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ"- শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুমোদিত হয়। অতঃপর ২০১৬ সালের ১৪ অক্টোবর China EXIM BANK-এর সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের এর ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একই দিনে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের মহামান্য প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাটানেল নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ৫ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রকল্পের ভৌত কার্যক্রম শুরু করা হয় । প্রকল্পটি ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সমাপ্তির কথা থাকলেও করোনা মহামারির কারণে মালামাল আমদানি ব্যাহত হওয়ায়, অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তা/শ্রমিক স্বল্পতা ও করোনাকালীন সরকার ঘোষিত স্বাস্থবিধি মেনে কাজ করতে কাজের গতি সীমিত হওয়ায় প্রকল্পেরমেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধি করে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর করা হয়।

"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল"এর উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন নির্মাণ কাজটি Design Build Contract- বিধায় ডিজাইন রিভিউ এবং কাজ তদারকি করার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন Supervision Consultant- SMEC-COWI JV- কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো। টানেল নির্মাণকালীন বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিষয়ের উপর বিভিন্ন ধাপে একাধিক বিদেশী বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিলো। বিশেষ করে টানেল নির্মাণের জন্য TBM Face Specialist, Cross Passage Specialist, Underground Specialist- নিয়োগ করা হয়েছিলো। ফলে প্রকল্পের পুরোকাজটির গুণগতমান তত্ত্বাবধানে ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। মূল টানেলের দৈর্ঘ্য ৩.৩২ কিলোমিটার, টানেল টিউবের দৈর্ঘ্য ২.৪৫০ কিলোমিটার, টানেলের মোট অ্যাপ্রোচ সড়কের দৈর্ঘ্য ৫.৩৫ কিলোমিটার , টানেল টিউবের সংখ্যা ২টি, টানেলের সর্বোচ্চ গভীরতা ৪২.৮০ মিটার, টানেলের ব্যাস (ভিতর) ১০.৮০ মিটার, টানেলের ব্যাস (বাহির) ১১.৮০ মিটার, টানেলের ভিতরে ২ লেন বিশিষ্ট সড়ক (প্রতিটি টিউবে) রয়েছে । টানেলটি রিখটার স্কেলের ৯ মাত্রার ভূমিকম্প সহনীয়, আগ্নেয়াস্ত শনাক্তকরণের জন্য টানেল উভয় প্রান্তে বসানো হয়েছে স্ক্যানার মেশিন এবং ইউভিএসএস সিস্টেম , Over Load Control- করার জন্য আছে ওজন স্কেল। টানেলটিতে মোট ব্যায় হয়েছে ১০ হাজার ৬৮৯ কোটি ৭১ লাখ টাকা।

কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে নির্মিত, “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল” যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করার পর আনোয়ারা প্রান্তে আবাসন প্রকল্পের বিকাশ, শিল্পোন্নয়ন, পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটছে। আনোয়ারা প্রান্তে পর্যটন শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে পার্কি বীচে সংলগ্ন একটি দৃষ্টিনন্দন সার্ভিস এরিয়া নির্মাণ করা হচ্ছে। পরবর্তীতে রিসোর্ট হিসাবে ব্যবহারযোগ্য এই সার্ভিস এরিয়াতে একটি ভিআইপি বাংলো, ৩০টি সাধারণ বাংলো, ৭৫০ জন ধারণ ক্ষমতার একটি কনভেনশন হল, ০১ টি রিসোর্ট রিসেপশন বিল্ডিং, ৪৮ ইউনিটের একটি মটেল মেস, ০১ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ০১ টি মিউজিয়াম, ০১ টি মসজিদ, ০২ টি দৃষ্টিনন্দন ব্রিজ, সুইমিং পুল, ০১ টি হেলি প্যাড, ০২ টি পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট, স্টাফদের জন্য থাকার আবাসন ব্যবস্থাসহ আরো অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি রয়েছে। টানেলটি দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন মাধ্যম হওয়ায় চালক ও সর্বসাধারণের জন্য অডিও ভিজুয়াল ব্যবহার নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। টানেলটি যানবাহনের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার পরে টানেলের অভ্যন্তরে অগ্নিকান্ড বা যে কোন ধরনের দুর্ঘটনায় জরুরি প্রয়োজনে ৩টি ক্রস প্যাসেজের (প্রায় ৬০০ মিটার অন্তর অন্তর) মাধ্যমে পাশের নিরাপদ টানেল টিউবে গমন করে নিরাপদে বের হয়ে যাবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়াও জরুরি প্রয়োজনে রোড ডেক এর নিচে এস্ক্যাপ গ্যালারিতে প্রবেশের জন্য ৮০ মিটার অন্তর অন্তর উভয় টানেল টিউবে ৩০টি করে মোট ৬০টি এস্ক্যাপ চ্যানেল রয়েছে। উক্ত এস্ক্যাপ চ্যানেলে স্লাইডিং এর মাধ্যমে প্রবেশ করে নির্দেশিত কাছাকাছি দূরত্বে গমন করে সিঁড়ি ও লিফট এর মাধ্যমে নিরাপদে টানেলের ভেতর থেকে প্রস্তান করার সুযোগ রয়েছে।

টানেলটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হওয়ায় চট্রগ্রাম বন্দরের কর্মক্ষমতা অক্ষুন রেখে পরিবহনের কেন্দ্র হিসেবে চট্রগ্রামের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে । ঢাকা-চট্রগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে অর্থাৎ চট্রগ্রাম শহরকে বাইপাস করে সরাসরি ঢাকার সাথে কক্সবাজারের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে ।কর্ণফুলী নদীর উভয় পাশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের কারণে আনোয়ারা প্রান্তে শহর সম্প্রসারিত হবে । কর্ণফুলী নদীর উপর বিদ্যমান ০২ (দুই) টি সেতুর উপর যানবাহনের চাপ কমে আসছে ।এর মাধ্যমে মূল শহরের নগরবাসীকে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব পাশে বসবাসে উৎসাহিত করবে । চীনের সাংহাই শহরের ন্যায় চট্রগ্রাম শহর “One City and Two Town”- মডেলে গড়ে উঠবে। এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ স্থাপিত হবে ।

“বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল” যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হওয়ায় বন্দরনগরী চট্রগ্রাম তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে । চট্রগ্রাম শহরকে বাইপাস করায় ঢাকার থেকে কক্সবাজারের দুরুত্ব প্রায় ৫০ কিমি কমে যাবে এবং চট্রগ্রাম শহরের যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে। টানেলসহ যে কোন মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি ও অভিজ্ঞতায় ঘটতিকে পূরণ করবে। ভবিষ্যতে দেশীয় প্রকৌশলীরা টানেল/সাবওয়ে নির্মাণে তাদের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়ন সাধন করতে পারবে। মীরসরাই থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিনিয়োগের বিশাল সম্ভাবনা ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে । “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল” যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হওয়ায় আনোয়ারা প্রান্তে আবাসন শিল্পের বিকাশ, শিল্পোন্নয়ন, পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। এই টানেল নির্মাণের ফলে জাতীয় জিডিপি ০.১৬৬% বৃদ্ধি পাবে। ফলশ্রুতিতে রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নকল্পে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ বিনির্মাণে “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল” অনবদ্য অবদান রাখবে।

#

পিআইডি ফিচার